সমকাল

তারিখ ... 14 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

শিক্ষার্থী নেই, আছে শুধু পরীক্ষার্থী

শিক্ষা | আমিরুল আলম খান

শিক্ষাবিদ; সাবেক চেয়ারম্যান
যশোর শিক্ষা বোর্ড

তাবৎ দুনিয়ায় শিক্ষার্থী আছে: তাদের কাজ জ্ঞানানুশীলন। আছেন শিক্ষক। তাদের দায়িত্ব জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষাদান। কিন্তু দুনিয়ায় এমন একটি দেশও আছে, যেখানে আছে শুধুই পরীক্ষার্থী, কোনো শিক্ষার্থী নেই। শিক্ষক আছেন, যাদের কাজ শুধু পরীক্ষা নেওয়া। সেদেশে জন্মের পর থেকেই শিশুকে একের পর এক পরীক্ষা দিতে হয়। হলে পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়েই আরেক দফা পরীক্ষা দিতে হয় বাবা-মায়ের কাছে। এ পরীক্ষা হলের পরীক্ষার চেয়ে ভয়ঙ্কর। উত্তর দিতে না পারার শাস্তি তাকে ভোগ করতে হয় তাৎক্ষণিক, প্রকাশ্যে। তখনও তার বোল ফোটেনি, কিন্তু জনসমক্ষে সে লাঞ্ছিত হয় আপন জনক-জননীর হাতে। তার শিশুমন অপমানিত হয়। লজ্জায় লাল হয়ে যায় তার চোখ, কান, মুখ। কান্নায় ভেঙে পড়ে। না পারার যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খায়, সারা জীবন। সে আরও যন্ত্রণায় কাতর হয় যখন তারই পড়শি বা কোনো জ্ঞাতি ভাইবোন সে প্রশ্নের উত্তর জানে, পরীক্ষায় সে সঠিক উত্তর দিয়েছে। তার সঙ্গে তুলনা করে সন্তানকে নাজেহাল, অপমান করা হয়।

শিশু সারাজীবন এই না-পারার লজ্জায়, অপরাধবোধে ভোগে। জন্মদাতার নির্দয় ব্যবহার তার জীবনকে তাড়িয়ে বেড়ায়। তার আত্মবিশ্বাস বিনষ্ট হয়। পৃথিবীকে তার অচেনা মনে হয়। সমস্ত প্রকৃতি যেন তার দুশমন। সে ভালোবাসতে ভুলে যায়। মানুষের ওপর সে বিশ্বাস হারায়। মাদকাসক্ত হয়। সুস্থ চিন্তা করতে পারে..না। নিজেকে অপদার্থ ভাবতে শেখে। সমাজের কল্যাণে কোনো ভূমিকা রাখে না। বরং নিজেকেই ধ্বংস করতে চায়। হিংসাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। এভাবে বেড়ে ওঠা শিশুরা মিলে এক হিংসার পৃথিবী গড়ে তোলে। নিজের গড়ে তোলা হিংসার রাজ্যে সে হয়ে ওঠে আত্মবিনাশী। সেদেশে এমন শিশুর সংখ্যা এখন কয়েক কোটি! বিশ্বাস না হলে মনোচিকিৎসকদের দরজায় উঁকি দিয়ে দেখুন একবার।

পরীক্ষার এমন সর্বনাশা পরিণাম বোধ হয় সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন মহামতি সক্রেতিস। তিনিই শিক্ষার কেন্দ্রে স্থান দেন শিশুকে। কিন্তু তার শিষ্যরা তার এই শিশুপ্রেম ভালো চোখে দেখেনি। তাই শিশুদের বিপথগামী করার অভিযোগে সমাজপতিরা তাকে বিষপান করিয়ে হত্যা করে। তার এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রায় দেড় হাজার বছর পর আরেকজন জা জ্যাক রুশো শিক্ষার নামে শিশুর ওপর এই অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেন। সেই থেকে শিশুর শিক্ষায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুনিয়ার জ্ঞানী মানুষরা বিরামহীন প্রতিবাদ করে চলেছেন। মন্তেসেরি, হার্বার্ট, রবীন্দ্রনাথ, শ', ব্লুম প্রমুখ তা সমস্বরে অবিরাম বলে চলেছেন। তারা বলছেন, ভালোবাস শিশুকে। যত বেশি ভালোবাসা দেবে, তারা তোমাদের তত বেশি মঙ্গল করবে।

কলকাতার সব থেকে বনেদি আর প্রতাপশালী পরিবারের শিশু রবীন্দ্রনাথ বারবার স্কুল থেকে পালিয়ে বেঁচেছেন। বার্নার্ড শ' তার কোনো রচনা শিশুপাঠ্য বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে দেননি এ কথা বলে যে, শিশু নির্যাতনের জন্য কিছুই তিনি রচনা করেননি। তিনি মনে করতেন, শিশুর পাঠ্য বলে যা চালানো হয় তার সবই শিশুদের ওপর চরম নির্যাতন বই আর কিছু নয়।

কিন্তু আমরা একটি অস্বাভাবিক দেশ বানাচ্ছি।

সেখানে রাষ্ট্র প্রথমেই মানুষের অধিকার অস্বীকার করে। আর তার চর্চা শুরু হয় শিক্ষার নামে শিশু নির্যাতনের মাধ্যমে! সে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় কেরানিকুলের পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে। সে রাষ্ট্রে শুধু কেরানিরাই জ্ঞানী, কর্মদক্ষ, সুবিবেচক, সুবিচারক বলে গণ্য। তাদের কুমন্ত্রণায় রাষ্ট্রটি ক্রমেই ব্যর্থতার দিকে ধেয়ে চলেছে।

শিশু মাতৃগর্ভে আসার মুহূর্ত থেকে প্রথম পরীক্ষা দেওয়া শুরু করেন জননী নিজে। দেশের সবচেয়ে নামি, সবচেয়ে দামি স্কুলে তার গর্ভস্থ সন্তানকে ভর্তি করতে হবে। না পারলে মা হিসেবে ব্যর্থ প্রমাণিত হবেন তিনি। তাই শিশুর জন্মের পরপরই তিনি শিশুকে মহাজ্ঞানী করে তোলার সাধনায় নামেন। আহারে, বিহারে, জাগরণে, নিদ্রায় চলে শিশুর শিক্ষাদান। এ জন্য নিয়োজিত হন হরেক নামের তথাকথিত সেরা পণ্ডিতরা! পুতুল খেলার সময় ছোট্ট শিশুর সময় কাটে কোচিং নামক রৌরব নরকে। পিতা-মাতার স্বপ্নপূরণের বলি হয় শিশু। এই স্বপ্ন অহর্নিশ শিশুকে যন্ত্রণা দেয়, অপমানিত করে, হিংসাশ্রয়ী করে তোলে।

এরপর শিশুর কাঁধে চাপানো হয় রাশি রাশি জ্ঞানের বোঝা, যার কেতাবি নাম পাঠ্যপুস্তক বা টেক্সট বুক। এই 'অপাঠ্য' টেক্সট বুকের চাপে শিশুর সর্বনাশের আরেক ধাপ অবনতি ঘটে। তার সঙ্গে আরও এক পাহাড় মহাজ্ঞানের ভাণ্ডার ইংরেজি বই! তার ওপর চাপানো হয় সমাপনী পরীক্ষার হিমালয় পর্বতমালা। ফলে শিশু নিজেকেই নিজের শত্রু মনে করতে শুরু করে। পঞ্চম শ্রেণির সমাপনীর তিন বছর পর জুনিয়র পরীক্ষার আরেক দৈত্য কাঁধে ভর করে। তাতে শিশু নাকি পরীক্ষা নামক উৎসবে মেতে ওঠে। অন্তত এ দেশের কেরানিরা সে অমৃতবাণীই ফেরি করে।

গত প্রায় এক দশক ধরে প্রবল জনবিরোধিতা উপেক্ষা করে তারা শিশুদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই অপকর্মটি করে চলেছে রাষ্ট্র। বাঙালি শিশুর জীবনে এক প্রাথমিক সমাপনীর যেন সমাপন নেই!

মাত্র সেদিন দুই শিক্ষামন্ত্রী একযোগে সাংবাদিক ডেকে জানালেন যে, তারা দু'জনেই একমত হয়েছেন, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এখন থেকে দেখভাল করবে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জাতীয় শিক্ষানীতি পাস হয় ২০১০ সালে। তারপর কর্তাদের একটা লম্বা ঘুমে কেটে গেছে। তাদের হাতে ব্রহ্মাস্ত্র আছে, জামায়াত-বিএনপির ঠেলায় তারা গত ৬ বছরে এ সংক্রান্ত আইন করার ফুরসত পাননি। কিন্তু এখন যে তারা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা ঘোষণা করলেন তার আইনি কাঠামো কোথায়? শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে বলে তার আইনি ভিত্তি লাগবে না? কেমন হবে সে প্রাথমিক শিক্ষা? কেমন তার সিলেবাস, কারিকুলাম? কে পড়াবেন? কোথায় পড়াবেন? দেখভাল করবেন কে? কার কাছে শিক্ষকের থাকবে জবাবদিহি? তাদের বেতন, চাকরির অন্য শর্তাবলি কী কী? কোন্ যোগ্যতা প্রয়োজন হবে প্রাথমিক শিক্ষকের? আবার দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর হলে সেখানেও এসব প্রশ্ন উঠবে।

এই যুগান্তকারী পরিবর্তনে যেসব সংকট তৈরি হবে তা মোকাবেলা করা হবে 'কীভাবে? প্রশাসন চলবে কার হুকুমে? কে বেতন দেবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত যারা পড়াবেন সেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের? তিনি কি বেসরকারি না সরকারি শিক্ষক হিসেবে গণ্য হবেন? অবকাঠামোই-বা কোথায় যে বিদ্যমান প্রাথমিক স্কুলগুলোয় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ দেওয়া যাবে? আর পাঠ্যপুস্তক? না, এসব বিষয়ে কোনো প্রস্তুতিই নেই। অথচ জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরির সময়ই এসব বিষয়ে বিজ্ঞজনরা সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কেউ তা কানে তোলেনি।

আইন নেই, আছে শুধু ঘোষণা। এ রকম আজগুবি ঘোষণা দিয়েই দেশটা চলছে। দেশে যে প্রাথমিক সমাপনী, জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষা চালানো হচ্ছে এত বছর ধরে, তার কোনো আইনি ভিত্তি নেই। আছে শুধু 'নির্বাহী আদেশ'! দেশ চলে আইনে নয়, নির্বাহী আদেশে! এখনও তাই। শিক্ষাক্ষেত্রে এত বড় পরিবর্তনের ঘোষণা এলো, কিন্তু কোনো আইন পাস করা হলো না সংসদে! শিক্ষা বোর্ডগুলো চলে ১৯৬১ সালের অর্ডিন্যান্সে। সেখানে শুধু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা আছে। সমাপনী বা জুনিয়র পরীক্ষার কথা নেই কোথাও।

আবার পরীক্ষার কথায় ফিরে যাই। যেদিন শিশুর লেখাপড়া শুরু হয়, সেদিন থেকেই শুরু তার পরীক্ষা দেওয়া। শুধু স্কুলে নয়, তার আসল ও কঠিনতম পরীক্ষা দিতে হয় কোচিং নামক দৈত্যের কাছে। সেখানে প্রতিদিন তার নানা কিসিমের পরীক্ষা চলে। যত পরীক্ষা তত নাকি পণ্ডিত হওয়া। এ পরীক্ষা-দৈত্য তার ঘাড় থেকে কখনও নামে না। নামলে হাজার হাজার কোটি টাকার বাণিজ্য যে অচল হয়!

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা আরও ভয়াবহ। সেখানে সপ্তাহে সাত দিনই পরীক্ষা চলে। ছুটির দিন শুক্রবার শুধু কাগজে। বাস্তবে সেদিনও পরীক্ষা নিতে হয়। লেখাপড়া লাটে উঠেছে। শিক্ষকের আসল কাজ পড়ানোর দিন শেষ হয়েছে। এখন শুধু পরীক্ষা নাও, জবরদস্তি পরীক্ষা।

তাহলে শিক্ষার্থী শেখে কোথায়? কার কাছে? কখন শেখে? কী শেখে? এসব প্রশ্ন করতে বারণ! দেশটা তো পরীক্ষার। যত পরীক্ষা, তত বৈভব এক শ্রেণির মানুষের। তারা সার্টিফিকেট বিক্রির ব্যবসা ফেঁদেছে। শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা সেখানে অবান্তর।

দুনিয়ায় এমন আজব দেশ আছে মাত্র একটিই। নাম তার বাংলাদেশ। রক্ত দিয়ে লেখা নাম বাংলাদেশ।